The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

[Buddhadev Bose's poetic Drama : Eastern and Western Influences]

Papy Biswas
PhD Researcher, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 17 June 2025
Received in revised: 01 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Poetic drama, Western tradition, Eastern tradition, Eliotian poetic drama, Tagoric poetic drama.

ABSTRACT

Buddhadev Bose (1908-1974) is one of the foremost pioneers of modern poetic drama in Bengali literature. In Bengali literature Rabindranath Tagore (1861-1941) was the first creator of this dramatic form and when this new form was flourishing in his hands, the true shape of poetic drama had not yet been firmly established in English literature. In 1930's the development of modern poetic drama in Western literature attained a certain maturity under the guidance of T. S. Eliot. For this reason, When Buddhadev Bose began writting poetic drama, he found before him two guiding ideals–Rabindranath and Eliot. Buddhadev Bose chose myth as the thematic foundation of his poetic dramas. The focus of this essay is whether, in composing these myth-based plays, he employed purely western methods or incorporated elements of the Eastern traditional as well.

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সেই সঙ্গে বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বাংলা কাব্যনাটককে একটি স্বতন্ত্র ও সমুন্নত রূপ দান করতে যে সকল নাট্যকারের অবদান অনস্বীকার্য বুদ্ধদেব বসু তাঁদের অন্যতম। বিশ শতকের বিশের দশকে (১৯২০-১৯২৯) বুদ্ধদেব বসু নাটক রচনা শুরু করলেও তাঁর নাট্যপ্রতিভা পূর্ণ প্রকাশ পেতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল, মোটামুটি ষাটের দশকে আমরা নাটকে নিবেদিতপ্রাণ বুদ্ধদেব বসুকে পাই। ষাটের দশকের শুরুতে তাঁর চিন্তা চেতনায় বোদলেয়ারের নিয়তিবাদ ও বিষাদ যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি মহাভারতের নতুন পাঠও বুদ্ধদেব বসুকে জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাববার রসদ যুগিয়েছিল। একারণে সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে যে নাট্যভাবনা তাঁর মধ্যে সামান্য আলোড়ন তুলেছিল তা এই সময়ে এসে পরিপূর্ণ রূপ পায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যিক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের মোট বত্রিশটি নাটক রচনা করেছেন, এর মধ্যে কাব্যনাটক পাঁচটি। কবিতায় সংলাপ রচনা এবং নাট্যধর্মের যথাযথ সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে এই অভিনব আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন এই নব আঙ্গিকটি বিকাশ লাভ করে তখনও ইংরেজি সাহিত্যে কাব্যনাটকের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পায়নি। ১৯৩০ এর দশকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিক কাব্যনাটকের বিকাশ ও এক ধরনের পূর্ণতা লাভ করে এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) হাত ধরে। একারণে, বুদ্ধদেব যখন কাব্যনাটক লেখা শুরু করেন তখন তাঁর সামনে দুটো আদর্শ ছিল–রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট। কাব্যনাটকের বিষয় হিসেবে বুদ্ধদেব বসু পুরাণকে বেছে নিয়েছিলেন। এলিয়টের *মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল* (১৯৩৫) ও *ফ্যামিলি রিইউনিয়ন* (১৯৩৯) নাটক দুটিকে আধুনিক কাব্যনাটকের বিশিষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। বুদ্ধদেব বসু এসব নাটক থেকে কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নাটকে এলিয়টের কোনো প্রভাব আছে কি না, তাঁর নাটকে প্রাচ্য প্রভাব কতটা ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে তিনি কোন রীতি ব্যবহার করেছেন–এক কথায় নাট্যরচনায় তিনি নিরঙ্কুশ পাশ্চাত্য রীতি ব্যবহার করেছেন নাকি প্রাচ্য মিশেছে, আলোচ্য প্রবন্ধে সেটাই খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি।

কাব্যভাষার প্রাণ-প্রাচুর্য ও ভাবগভীরতার আধিক্যের কারণে কবিতা সাহিত্যের অন্য সকল শাখাকে প্রভাবিত করেছিল, একারণেই পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্য একসময় কাব্যাকারে লেখা হতো। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে, 'কাব্য দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত–দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য এবং ইহা সকল প্রকার কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ'[১]। অতএব একথা স্পষ্ট যে নাট্যসাহিত্যের সূচনাপর্বে নাটক কাব্যশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কাব্যনাট্যেই ঘটেছে নাটকের সূচনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুটি নাট্যকলা, গ্রীক নাট্যকলা ও এলিজাবেথীয় নাট্যকলার প্রকাশ-মাধ্যমও ছিল কবিতা। প্রতিভাধর কবি ও নাট্যকারদের হাতে মানবহৃদয়ের তীব্র অনুভূতি ও আবেগ এই কাব্যভাষার মাধ্যমেই সাহিত্যিক রূপ পেয়েছিল। সেসময়ে নাট্য সংলাপে কাব্যভাষার প্রয়োগ ঘটেছিল স্বাভাবিকভাবেই। তাই এই রচনাকে কাব্যনাটক বলে নামকরণের প্রশ্ন আসেনি। এটাকে শুধু নাটক রূপেই চিহ্নিত করা হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পরে নাটককে যেন উপন্যাসের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। দর্শকের মনোরঞ্জন ও তাদেরকে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কমেডি নাটকের প্রচলন হয় এবং সংলাপের উৎকৃষ্ট ভাষা হিসেবে গদ্যভাষা পাকাপোক্ত জায়গা করে নেয়। উনিশ শতকের এই সময়টায় নেপোলিয়নীয়

যুদ্ধের সমাপ্তি ও ব্রিটেনে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটে। ফলে দাসপ্রথার বিলুপ্তি, ব্যাপক নগরায়ণ, ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা, আধুনিকতাবাদ ও বস্তুবাদের ক্রমবর্ধমান প্রসার জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পারিপার্শ্বিক সমাজ-বাস্তবতা, বিশ্ব রাজনীতি সর্বোপরি চিন্তা-চেতনার জটিল বিন্যাস মানুষের শাশ্বত বিশ্বাসগুলো ভেঙে দেয় ও সৃষ্টির নবতর আকাঙ্ক্ষা মানুষকে রোমান্টিক ভাব-কল্পনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে জটিল জীবনবাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে শেখায়। ফলে কল্পরাজ্যে বসবাসকারী রোমান্টিক মানসিকতাসম্পন্ন মানবহৃদয় বাস্তবতার মধ্যে নিজেকে খুঁজতে শুরু করে। এই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন সাহিত্যিকগণ। ফরাসি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার Emile Zola (1840-1902) তাঁর *Therese Raquin* (টেরেসা র‍্যাকুঁয়া) (১৮৬৭) উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে সেই গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন বলে আলী আনোয়ার তাঁর *আধুনিক ইউরোপীয় নাটক* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন :

> চক্রান্ত, জালিয়াতি, কারাগারে বন্দী নায়ক, বিষাক্ত মৃত্যু প্রভৃতি রোমহর্ষক ঘটনা সংবলিত রোমান্টিক নায়কের অনুজ মধ্যবিত্ত মেলোড্রামা—যেখানে আছে অপহৃত শিশু, হঠাৎ আবিষ্কৃত দলিল, মধুরেণ সমাপয়েৎ, তেমন নাটকের দিন শেষ হয়ে গেছে। পবিত্র বিশুদ্ধ নীতিবান নায়কেরা কেবল জিতে যায় এবং নীতিবর্জিত খলনায়কেরা প্রভূত চক্রান্ত করেও কেবল হেরে যায় অথবা আকস্মিকভাবে তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে—এ ছক আর চলবে না। তা দর্শকের দেহে ক্লান্তি উৎপাদন করেছে। নতুন ধরনের নাটক দরকার যা হবে বাস্তবধর্মী, বৈজ্ঞানিক।[২]

এ কারণে সাহিত্যে নতুন আঙ্গিকের উদ্ভাবন যেন যুগের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়ট বলেছেন, 'So the poet with ambitions of the theatre, must discover the laws, both of another kind of verse and another kind of drama.[৩] বৈশ্বিক পট পরিবর্তনের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ফরাসি সাহিত্যিকদের হাত ধরে বিশ্বনাটকে বাস্তবতার দাবি ঘোষিত হয় এবং বিশ শতকের শুরুতে 'বাস্তবতার প্রতিক্রিয়ায় চেতনালোকের রহস্য উদঘাটনে উৎসুক কবিরা নতুন এক আঙ্গিক আবিষ্কার করলেন। কবিতার এই নতুন আঙ্গিকই হলো কাব্যনাট্য।'[৪]

এ পর্যায়ে নাট্যকারেরা কাব্যনাটকের তাত্ত্বিক দিককে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বিষয়বস্তু নির্বাচন, প্রকাশভঙ্গি ও ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে কাব্যনাটকের পুরাতন রীতির পরিবর্তে নতুন এক রীতির প্রচলন ঘটে যেখানে গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে অন্তর্বাস্তবতার প্রাধান্য ও স্বতন্ত্র চরিত্র নিয়ে কাব্যসংলাপ সহযোগে নতুন এক নাট্যধারার প্রচলন ঘটে। এই আন্দোলনের সম্মুখভাগে আমরা পাই টি. এস. এলিয়টকে।

কাব্যনাটকের স্বরূপ আলোচনায় এলিয়ট বেশ কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যেগুলো কাব্যনাটকের তত্ত্বগত ধারণাকে পরিবর্তিত করেছে এবং আধুনিক কাব্যনাটকের নতুন একটা ফর্ম সৃষ্টি হয়েছে। এলিয়ট বলেছেন, যদি কবিতা ও নাটকের সুষম সংযোগ ঘটে তাহলে সেটি কাব্যনাটকে অন্তর্লীন সাংগীতিক আবহ (Musical Pattern) সৃষ্টি করে। ফলে কাব্যনাটকে দুটি স্তরের সৃষ্টি হয়– প্রথম স্তর বা বহিরাঙ্গে সাধারণ নাটকের মতো বৃত্ত, কাহিনি, কাঠামো, চরিত্র প্রভৃতি উপাদান আর দ্বিতীয় স্তর বা অন্তরাঙ্গে থাকবে গভীর কোনো অনুভূতির জগতকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা। এলিয়ট মনে করতেন, প্রতিটি কবিতার মধ্যেই নাটকীয়তা রয়েছে এবং সচেতনভাবেই কবিকে এই নাটকীয়তা ধরে রাখতে হয় কবিতায়। এই কাব্যশক্তিকে নাটকীয় কাঠামোয় ব্যবহার করে নতুন ধারার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এলিয়ট, তিনি বলেছেন, 'If we want to express the permanent and the universal, we tend to express ourselves in verse.'[৫] মূলত কাব্যভাষা বাস্তবকে যে রূপে প্রকাশ করতে পারে তা অনেক গভীর ও ব্যাপক এবং কাব্যকেই নাটকের স্বাভাবিক প্রকাশমাধ্যম হিসেবে তিনি মনে করেন। ১৯৩৫ সালে ২৫ নভেম্বর The Listener পত্রিকায় প্রকাশিত এক বেতার ভাষণে এলিয়ট বলেন, `I believe that poetry is the natural and complete medium for drama.'[৬] কাব্যনাটকের ভাষাকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করতে তিনি নাটকে ছন্দ, অলঙ্কার এমনকি সঙ্গীত আর ব্যালে নৃত্যকেও যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তবে সবকিছু সরল ও স্বাভাবিক রেখে সেটা দর্শকের কাছে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে তিনি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই কাব্যনাটককে বলা হচ্ছে 'সময়ের সচেতন সৃষ্টি।'[৭] কাব্যনাট্যের ভাষা নিয়েও তিনি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। রাম বসু মন্তব্য করেছেন, 'আমার ধারণায় এলিয়ট কাব্যনাটকের তত্ত্বকে টানতে টানতে গদ্যের রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছেন।'[৮] এলিয়টের হাতে কাব্যনাটকের এই ধারাটি উৎকর্ষ লাভের পূর্বে আঠারো শতকের সকল কবিই, যেমন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪), জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১) প্রমুখ, কাব্যনাটক লেখার চেষ্টা করেছেন। যদিও তা নতুন ধারার কাব্যনাটকের সংজ্ঞা অনুযায়ী সার্থক হয়ে ওঠেনি তবুও এসব লেখকদের কাব্যনাটক লেখার প্রচেষ্টা ও সেসব নাটকের সার্থকতার মাপকাঠি দেখে একথা সহজেই অনুমেয় যে আধুনিক কাব্যনাটকের তত্ত্ব অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল।

বিশ্বসাহিত্যের এই নবনাট্য আন্দোলনের জোয়ার বাংলা সাহিত্যে এসেও দোলা দেয়। যদিও তার মধ্যে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। একারণে বাংলা কাব্যনাটকের ইতিহাস খুব বেশি প্রচীন নয়। কবিতায় সংলাপ ও নাট্যধর্মের যথাযথ সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে এই অভিনব কাব্যপ্রকরণের সৃষ্টি করেছিলেন। গীতিকবি হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত এই কবি এক সময় সৌন্দর্যমণ্ডিত রোমান্টিক জগৎ ছেড়ে বাস্তব জগতের ছবি আঁকতে শুরু করেন এবং

প্রকাশমাধ্যম হিসেবে বেছে নেন সংলাপধর্মী কবিতা নামক নতুন সাহিত্যাঙ্গিক। সংলাপধর্মী কবিতার উজ্জ্বলতম আকর্ষণ ছিল এর নাটকীয় প্রকাশভঙ্গি। এ সম্পর্কে উত্তম দাশ বলেছেন :

> গল্প নয় গল্পের নির্যাস চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনা থেকে উঠে আসা সংকট, সেই সংকট আশ্রিত নাট্যক্রিয়া কবিতাকে হাতে ধরে তুলে এনেছে, অন্তত সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে সেই অর্থেই এই ধারার রচনাকে আমি কাব্যনাট্য হিসাবেই মর্যাদা দানের পক্ষপাতী।[৯]

কাব্যাঙ্গিকে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪)। কিন্তু তাঁর কাব্যধর্মী নাটক রচনার সূচনা হয়েছিল *রুদ্রচণ্ড* (১৮৮১) নাটকের হাত ধরে। রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন এই নতুন আঙ্গিকটি বিকাশ লাভ করে তখনও ইংরেজি সাহিত্যে কাব্যনাটকের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পায়নি। সুতরাং একথা বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো রচনাকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, নিজের কবিত্বশক্তির শিল্পিত রূপায়ণের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন নতুন এই সাহিত্যাঙ্গিক এবং একথা অনেকেই স্বীকার করেন যে 'বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাটকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গঠনশৈলীর প্রাথমিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চায় পাওয়া যায়।'[১০] রবীন্দ্রনাথের হাতে কাব্যনাটকের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সেটা তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের নাট্যকারদের হাতে কিছুটা বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু কাব্যনাটকের সংহত রূপটি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ইউরোপীয় আধুনিক কাব্যনাটকের তত্ত্ব ও আঙ্গিকের উদ্ভব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কাব্যনাট্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ও আধুনিক কাব্যনাটকের তত্ত্বকে আত্মস্থ করে এই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কাব্যনাট্যকার হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর আবির্ভাব ঘটে এবং বাংলা কাব্যনাটকের ধারাটিকে তিনি একক হাতে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান যার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাটক চর্চার পথটি প্রশস্ত হয়।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যনাটক *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬)। নাট্যকার এই নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন ভারতপুরাণের আকরগ্রন্থ *মহাভারত* থেকে। নাটকের কাহিনি ছিল এরূপ–দুর্ভিক্ষ ও বৃষ্টিহীনতায় আক্রান্ত অঙ্গদেশের পরিত্রাণের উপায় হিসেবে অমিততেজা তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য হরণ করতে হবে এবং তাঁকে কামপাশে বিদ্ধ করে নগরে নিয়ে এসে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহপূর্বক সন্তান উৎপাদন করতে হবে। এই দুরূহ কাজের ভার অর্পিত হয় তরঙ্গিণী নামক এক বারাঙ্গনার উপর। এই বারাঙ্গনা এবং ঋষ্যশৃঙ্গের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, কাম-প্রেম ও পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হবার ঘটনা নিয়েই নাট্যকাহিনি আবর্তিত।

নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে গৃহীত হলেও নাট্যকার নাটকের চরিত্রায়ণ, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব ঢঙে। একথা বলার কারণ, মহাভারতের কাহিনি অনুসারে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয় এক মৃগীর গর্ভে কিন্তু বুদ্ধদেব সে স্থলে একজন কিরাত যুবতীকে ঋষ্যশৃঙ্গের মাতা হিসেবে দেখিয়েছেন। এছাড়াও মহাভারতে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে আনার কাজে একজন বৃদ্ধা বারাঙ্গনাকে নিযুক্ত করার কথা থাকলেও নাটকে তিনি তরঙ্গিণী নাম্নী এক যুবতী বারাঙ্গনার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং এখানেই নাট্যকারের মৌলিক ভাবনা সক্রিয় হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, এই যুবতী বারাঙ্গনা সম্পর্কিত চিন্তাটির খোরাক রবীন্দ্রনাথের "পতিতা" কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনিকে একটু পরিবর্তিত করে পতিতাকে প্রেমিকা নারীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই ভাবনাটিকে গ্রহণ করে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে ভিন্ন পথের পথিক দুজন নারী-পুরুষের কাম থেকে পুণ্যের পথে উত্তরণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নাটকীয়তার বাতাবরণে ঘেরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পতিতা" কবিতা থেকে বুদ্ধদেব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিতে আধুনিক নারী মনস্তত্ত্ব, প্রেম, কাম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটক রচনার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু এই নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন :

> এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ, একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো ক'রে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য, এ–ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও–কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হ'য়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।[১১]

বুদ্ধদেব তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাটকে গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন এবং ভাষায় 'কবিতার সূক্ষ্ম কারুকাজ বুনে তুলেছেন–একই সঙ্গে তিনি সচেতন-সংযমে কাব্যের রাশ টেনে ধরেছেন। ফলে কাব্যিক ভাষা প্রায় কখনো বিষয়ের নাট্যগুণকে অতিক্রম করেনি।'[১২] এলিয়টীয় কাব্যনাটকের আদলে তিনি কাব্যনাটকের শুরুতে গাঁয়ের মেয়েদের মুখে একটি কোরাস সংযোজন করেছেন। গাঁয়ের মেয়েদের এই সংলাপের উপর এলিয়টের *Murder in the Cathedral* নাটকের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন। এমনকি নাট্যকার নিজে বলেছেন :

> দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টিবিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত—এই সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিল তখন, রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিলো এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' নাটকটা। মনে পড়ে লিখেও ফেলেছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের মুখে প্রথম দুটো লাইন—সে-দুটো দিয়েই 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র আরম্ভ, যদিও সাতমাত্রা ছন্দ ও প্রথম দুটো শব্দ ছাড়া আদি লেখনের আর কিছুই সেখানে রক্ষিত হয়নি।[১৩]

গাঁয়ের মেয়েদের কোরাস দিয়ে নাটকের শুরুতে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে কাতর মানুষদের জন্য দেবরাজের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে। এলিয়ট তাঁর `The Waste Land' কাব্যে `From Ritual to Romance'-এর কাহিনির শুরুতে এক অনুর্বর, কর্কশ পোড়ো জমিতে এনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন যেখানে ফসল ফলে না। এলিয়টের মতো বুদ্ধদেবও যেন তাঁর এই কাব্যনাটকে অনুর্বর জমি ও বন্ধ্যাত্বের প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের রিক্ত, শূন্য ও বেদনার্ত অবস্থানটিকে তুলে ধরেছেন। গায়ের মেয়েদের কোরাস :

> আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
> মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা ;
> শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পরে দিন দীর্ণ শূন্য–
> বৃষ্টি নেই! [১৪]

"The Waste Land" কবিতায় টি.এস. এলিয়টের বর্ণনাও যেন এটারই প্রতিধ্বনি:

> ...Where the sun beats,
> And the dead tree gives no shelter, the cricket norelife,
> And the dry stone no sound of water.
> Only there is shadow under this red rock.[১৫]

বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে অঙ্কসংখ্যা চার। কাব্যনাটক যেহেতু প্রচলিত নাটকের মতো পঞ্চাঙ্ক রীতির অনুসারী নয় এবং তত্ত্বগত দিক থেকেও আলাদা সেক্ষেত্রে কাব্যনাটকে সেসব উপাদানের পূর্ণ উপস্থিতি আশা করা পাঠক ও দর্শক কাব্যনাটক দেখতে গিয়ে কিছুটা আঘাত পেতে পারেন। এপ্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য, 'কাব্যনাটক ভিন্ন জাত ও গোত্রের নাটক। আমি আলিবাবা দেখতে যাচ্ছি না, দেখতে যাচ্ছি কাব্যনাটক। এই মানসিক প্রস্তুতি থাকা অবশ্যই দরকার।'[১৬] *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে আটটি প্রধান চরিত্র ও বেশ কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র সহযোগে নাট্যকাহিনি আবর্তিত হয়েছে যেখানে ব্যবহৃত প্লটটিকে আমরা বৃত্তাকার জটিল প্লট বলতে পারি। নাট্যকাহিনির প্রারম্ভ, উৎকর্ষ, শীর্ষবিন্দু ও সমাপ্তি প্রতিটি পর্যায়ই নিপুণভাবে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পেছনে ফেলে এই কাজে যারা অংশ নিয়েছে তাদের অন্তর্বেদনা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের চিত্রায়ণই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে যেখানে নাটকের বিষয় বা কাহিনি একটা কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকটি সার্থক কাব্যনাটক হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় কাব্যনাটক *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৮)-র কাহিনি মহাভারতের মৌষল পর্ব থেকে গৃহীত। নাট্যকার নাটকটিতে স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের মাধ্যমে বৃহৎ এক সময়ের আবর্তন ও একটা যুগের সমাপ্তি দেখিয়েছেন, সেইসঙ্গে মানব-ইতিহাসের শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, কৃষ্ণের সম্মুখেই যদু বংশ ধ্বংশ হবে। সেই অভিশাপেরই প্রতিফলন ঘটেছে *কালসন্ধ্যা* নাটকটিতে। আলোচ্য নাটকে মানব জীবনের অদৃষ্টবাদ ও অনিবার্যতাকে তুলে ধরা হয়েছে। জীবনের প্রবাহ কখনো থেমে থাকে না। কালচক্রে অতীত আবার ভবিষ্যতের মধ্যে প্রোথিত হয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কীর্তি মুছে যায়, নতুন কীর্তিমানের জন্ম হয়। পার্থিব জগতে কিছুই নতুন নয়, সবই পুরাতন ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তবুও জীবন অনন্ত, রহস্যের ছায়া দ্বারা আবৃত।

বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যা* নাটকে যাদবদের ধ্বংসের কাহিনি বর্ণনায় পৌরাণিক অনুষঙ্গের পাশাপাশি আধুনিক চিন্তাধারার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং নাটকটিতে একটি সরলরৈখিক প্লট ব্যবহার করেছেন। এই নাটকে দুইটি পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক এবং নাটকের শুরুতে তিনি 'পূর্বরঙ্গ' এবং শেষে 'উত্তরকথন' নামে নাটকের বর্ধিতাংশ যোগ করেছেন। গ্রীক নাটকের Prologue এবং Epilogue আকারেই বুদ্ধদেব বসু এই দুটি বিষয় সংযোজন করেছেন। কাব্যনাটক প্রচলিত নাটকের চেয়ে যে আলাদা বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে তা বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাটকের দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায়।

কালসন্ধ্যা কাব্যনাটকে বুদ্ধদেব বসু নাট্যঘটনার প্রয়োজনে সাতটি মূল চরিত্র এবং সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরতে বেশ কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। মহাভারতে দৃশ্যমান অমিততেজা বীর চরিত্র অর্জুনকে নাট্যকার সৃষ্টি করেছেন প্রৌঢ়, অক্ষম একজন পরাজিত বীর হিসেবে। গাণ্ডিবে শর যোজনায় অসমর্থ অর্জুন দ্বারকার নারীদেরকে রক্ষা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে দস্যুদল কর্তৃক অপমানিত হয়। অর্জুনের কাছে এমন জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে হয়েছে। পরাজিত বীর অর্জুন চরিত্রটিকে আমরা স্যামুয়েল বেকেটের *Endgame* (1957) নাটকের 'হ্যাম' চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে পারি যেখানে হ্যাম

চারপাশের মৃত্যু, ধ্বংস, প্রলয় সবকিছু ছাপিয়ে বেঁচে থাকার পরেও জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। ঠিক তেমনিভাবে কৃষ্ণ বিনা জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পেতে ব্যর্থ অর্জুন দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে জানতে চেয়েছে :

যাকে সারাজীবন জেনেছি আমি 'আমি' ব'লে
সে কি তবে পরিত্যাজ্য নিঃসার নির্মোক,
অথবা পুত্তলিমাত্র–চালিত, অজ্ঞান,
স্বেচ্ছাচারী দেবতার হাতের পুত্তলি?[১৭]

বুদ্ধদেব বসুর এই কাব্যনাটকটিতে 'কাল' বা সময়কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আদতে কোনো ব্যক্তিচরিত্র না হলেও এই নাটকে কালই হয়ে উঠেছে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। প্রকৃতপক্ষে কাল অখণ্ড ও স্থির। সময়ের আবর্তনে মানবেতিহাস কাল থেকে কালান্তরে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়। সেখানে মানুষ খণ্ডকালের বাসিন্দা মাত্র। প্রবহমান সময়ের মাঝে মানবের অন্তর সত্তা যদি তাকে নিরাসক্ত চিরজীবনের পথে উত্তীর্ণ করে দেয় তাহলে মানুষ খণ্ডকালের বাসিন্দা হয়েও চিরকালীন হয়ে ওঠে। তখন তার উপলব্ধিতে ধরা দেয়, 'যা আছে, তা ধ্বংশের অতীত,/ যা নেই, তা কখনো ছিলো না।' বুদ্ধদেব বসুর এই কালচেতনা সঙ্গে এলিয়টের *Four Quarters* (1943) কাব্যগ্রন্থের কবিতার মিল পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্ট কৃষ্ণ চরিত্রের মুখে উচ্চারিত কাল চেতনা জ্ঞাপক উক্তিটি এলিয়টের এই কবিতার সঙ্গে তুলনীয় :

Neither From nor towards; at the still point, there
the dance is,
But neither arrest nor movement.[১৮]

কালসন্ধ্যা কাব্যনাটকের সংলাপ সৃষ্টিতে বুদ্ধদেব এলিয়টের *মার্ডার ইন দ্যা ক্যাথিড্রাল* নাটকের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেছেন। প্রস্তাবনার মাধ্যমে নাটকের বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি নাট্যঘটনা বর্ণনায় নাট্যকার কোরাস ব্যবহার করেছেন। এলিয়টীয় ঢঙে না হলেও কোরাসের ধারণাটা তিনি এলিয়ট থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও 'বাংলা পদ্যভাষাকে অস্থিহীন নমনীয়তা থেকে এভাবে দৃঢ় সাহসিকতায় সরিয়ে আনার চেষ্টার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের উপর পশ্চিমী কবিতার প্রভাব লক্ষিত হয়।'[১৯] ইংরেজি কবিতার ধরনকে বুদ্ধদেব বাংলা কাব্যের আঙ্গিকে ধরার চেষ্টা করেছেন এই নাটকে :

তুমি ও আমি/দৃশ্য, শ্রব্য, স্পর্শনীয়
এই মুহূর্তে, এই দ্বারকায়।/কিন্তু, দ্যাখো, এ–মুহূর্ত এইমাত্র
অন্য এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো,/অন্য এক মুহূর্তে আবার।[২০]

বুদ্ধদেব বসুর তৃতীয় কাব্যনাটক *প্রথম পার্থ* (১৯৬৯)। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বদিনের একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কর্ণকুন্তী সংবাদ"–এর ঘটনা আর বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থ* নাটকের ঘটনা সংস্থান একই কিন্তু দুই কবি ভিন্ন ভাবে এই ভাষানুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর এই দুই সাহিত্যকর্ম নিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেছেন এমন–'তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব 'কর্ণকুন্তী সংবাদে' রোপিত হলেও এর ভাষানুষঙ্গ কবিতারই, কিন্তু বুদ্ধদেবের 'প্রথম পার্থ' সে তুলনায় চারিত্রিক দ্বন্দ্বসৃজন, দৃশ্যসজ্জা, সংলাপ রচনা, ভাষাব্যবহার–সবদিক থেকেই অনেক বেশি নাট্যধর্মী।'[২১] কর্ণের আদর্শবাদী দৃঢ়চেতা মনোভাব আর মৃত্যুচেতনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে নাটকটিতে যা কর্ণকে বীরের মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। কর্ণকে তাঁর কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করার সংকল্প থেকে ফিরে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ কর্ণের কাছে এসেছে। কিন্তু সকলেই তাঁর দৃঢ়চেতা মনোভাবের কাছে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর কর্ণ মৃত্যুর মূল্যেই আপন অস্তিত্বের পরীক্ষা ও সম্মান পেতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এলিয়টের *Murder in the Cathedral* কাব্যনাটকের টমাস বেকেট ও তাঁর টেম্পটরদের কথা মনে পড়ে। বেকেটকে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত থেকে ভ্রষ্ট করার জন্য টেম্পটররা নানাভাবে চেষ্টা করলেও টমাস বেকেট সত্যের মহিমা রক্ষায় মৃত্যুবরণের সংকল্পে অটুট ছিলেন। মৃত্যুর মূল্যে বেকেট ঈশ্বরকে পেতে চেয়েছিলেন। এলিয়টের টমাস বেকেটের মুখে উচ্চারিত হয়েছে :

For my Lord I am now ready to die,
That His Church may have peace and liberty.
Do with me as you will, to your hurt and shame;[২২]

অন্যদিকে কর্ণের মুখে উচ্চারিত হয়েছে :

আমি চাই না উদ্ভিদের মতো জীবন।
আমার সার্থকতা চেষ্টায়–সংগ্রামে।[২৩]

বুদ্ধদেব বসু এই কাব্যনাটকে কোনো কোরাসের ব্যবহার করেননি। কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের সঙ্গে কর্ণের দীর্ঘ কথোপকথন যেন তিনটি দীর্ঘ সংলাপে রূপ নিয়েছে যা কাব্যনাটকটিকে বিশেষত্ব দান করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বদিনে কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর কর্ণ পরাজিত হয়েছেন নিজের কাছেই। যুদ্ধের পূর্বে কর্ণ জেনেছেন, কুন্তী তাঁর মাতা। দীর্ঘদিন ধরে অর্জুনবধের লালিত স্বপ্ন আর সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, কেননা অর্জুন তাঁর সহোদর। জননীর প্রতি অভিমান, মনুষ্যত্বের টানাপোড়েন আর ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংক্ষোভ কর্ণকে তীব্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। জীবনের কাছে পরাজিত কর্ণ কৃষ্ণের মুখে জেনেছে তাঁর অন্তিম পরিণতির কথা। আজীবন অপমানিত কর্ণ নিয়তিকে মেনে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে মুক্তির প্রার্থনা করেছেন, যেন তাঁকে আর ফিরে আসতে না হয়। 'কর্ণের এই নির্বেদ ও বিষাদ, হয়তো বুদ্ধদেবের বোদল্যরীয় বিষাদ চিন্তার ফসল কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয় আধুনিক মানুষের অসহায় আর্তনাদ।'[২৪]

বুদ্ধদেব বসুর *সংক্রান্তি* (১৯৭০) কাব্যনাটকটিকে তাঁর কাব্যনাট্যধারার শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে অনেক সমালোচক স্বীকৃতি দেন। মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধ ও দুর্যোধনকে হত্যার কাহিনি ঘিরে এর নাট্যক্রিয়া আবর্তিত হয়েছে। একদিকে পুত্রস্নেহ অন্যদিকে ধর্মপ্রাণতা, এই দুয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মাতা গান্ধারীর মনস্তত্ত্ব ও সন্তানস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ মানসিকতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, মহাভারতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গান্ধারীর আবেদন' নামে এটি সংলাপাত্মক কবিতা রচনা করেন। এখানেও দুজনের নাট্যাভিব্যক্তিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

বুদ্ধদেব তাঁর *সংক্রান্তি* কাব্যনাটকটিতে কোনো অঙ্ক বিভাজন রাখেননি। নাট্যক্রিয়ার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধপূর্ব ঘটনা, বর্তমান যুদ্ধের বর্ণনা ও দুই নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-বেদনা উন্মোচনের প্রয়াস করেছেন নাট্যকার। সেইসঙ্গে পৌরাণিকতার বাতাবরণে সমকালীন সভ্যতার বিবর্ধমান ধ্বংসকে চিত্রিত করেছেন। যেখানে স্পষ্ট হয়েছে, মানবসভ্যতা কোনো কালেই যুদ্ধ এড়াতে পারেনি এবং সভ্যতার অগ্রগতি এই রক্তপাতের মধ্য দিয়েই ঘটে। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুনের সূচনা হয় ঠিকই কিন্তু সেই ধ্বংসের ভয়াবহতা এবং মৃত্যুর শোক কাটিয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে নতুন করে জীবন নির্বাহ করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাই যুদ্ধে পরাজিত ও বিজয়ী সকলেই হেরে যায়। জিতে যায় বৈরিতা। ধ্বংস ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ ও সভ্যতায় আসে ক্রান্তিকাল যা যুগের সংকট সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে আমরা W. B. Yeats-এর "The Second coming" কবিতার কথা স্মরণ করতে পারি। ইয়েট্স বলেছিলেন,

> Turning and turning in the widening gyre
> The falcon cannot hear the falconer;
> Things fall apart, the centre cannot hold
> mere anarchy is loosed upon the world.'[২৫]

সংক্রান্তি কাব্যনাটকের তিনটি চরিত্রই পৌরাণিক এবং নাট্যকার সংলাপে গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ নাটকে ব্যবহৃত সংলাপগুলো অন্যান্য নাটকের মতোই ব্যাঞ্জনাধর্মী ও কাব্যিকতায় মোড়া।

বুদ্ধদেব বসুর সর্বশেষ কাব্যনাটক *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০)। এই কাব্যনাটকের কাহিনি মহাভারতের আদিপর্ব থেকে গৃহীত বিদুরের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে রচিত। কাব্যনাটকটির কাহিনী এরূপ– হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর সুস্থ ও সামর্থ্যবান সন্তান জন্মদানের আশায় সত্যবতী দ্বিতীয়বারের মতো অম্বিকাকে ব্যাসদেবের যৌনসঙ্গী হতে বলে। কিন্তু ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সে নিজের স্থলে একজন দাসীকে এই কাজে নিযুক্ত করে। দাসী অঙ্গনা রাজবাড়ির দাসীবৃত্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় ও শুদ্র নারীর দেবভুঞ্জিতা হওয়া গৌরবের বলে মান্য করে সে ব্যাসদেবের সাথে রাত্রিযাপনে সম্মত হয়। সেই রাত্রির পরে দাসীর মুখে রসভলীলার বর্ণনা শুনে হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে অম্বিকা। চিন্তা করতে থাকে, সে চাইলেই এমন সুকোমল মিলনানন্দ গ্রহণ করতে পারত, হতে পারত সুস্থ স্বাভাবিক পুত্রের জননী। কিন্তু আজ সে সামান্য দাসীর কাছে হেরে গেছে। এই দাসীর গর্ভে জন্ম হয় বিদুরের। আলোচ্য কাব্যনাট্যে বিদুরের জন্মকাহিনিকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে অঙ্গনার হৃদয়াবেগ, যৌনতা ও মাতৃত্বের সুখ-স্বপ্ন। যৌনতা এখানে আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের এই নাট্যকাহিনির সঙ্গে W. B. Yeats-এর "Three Bushes" কবিতার মিল পাওয়া যায়। এই কবিতায় গৃহকর্ত্রীর প্রেমিকের সঙ্গে কর্ত্রীর আদেশে তার দাসী দেহজ পিপাসা চরিতার্থ করে ধন্য হয়। উল্লসিত দাসীটি সেই দেহমিলনের বর্ণনা তার পরদিন কর্ত্রীকে শোনায়, যা তাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে:

> 'So you must lie beside him
> And let him think me there.
> And maybe we are all the same
> Where no candles are,
> And maybe we are all the same
> That strip the body bare.'[২৬]

অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু অম্বিকার মুখে উচ্চারণ করিয়েছেন :

> তাঁর কাছে সব নারী সমান,
> হোক অম্বিকা, অম্বালিকা, বা অঙ্গনা!
> ...নারীর মুখ তাঁর দৃষ্টব্য নয়, শুধু দেহ এক সুরঙ্গ,[২৭]

অনাম্নী অঙ্গনা কাব্যনাটকে নাট্যকার একটি সরলরৈখিক প্লট ব্যবহার করেছেন এবং নাটকটিতে কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই। কর্তব্য, কাম ও আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে তিনজন নারীর হৃদয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই নাট্যকাহিনি আবর্তিত হয়েছে। *অনাম্নী অঙ্গনা* কাব্যনাটকের সংলাপ রচনায় বুদ্ধদেব বসু গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন এবং সংলাপ সৃষ্টিতে অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সংলাপের পৌরাণিক ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখার পাশাপাশি চরিত্রের মনন ও আবেগের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করতে নাট্যকার কাব্যধর্ম ও গীতিময়তার আশ্রয় নিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কাব্যনাটকের ধারাটিকে অঙ্গীকার করে কাব্যনাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, বুদ্ধদেব এই আধুনিক সময়ে এসে পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার না করেও কাব্যনাটক রচনা করতে পারতেন এবং এমন অনেক উদাহরণ তাঁর সামনে ছিল। কিন্তু তিনি কেন তাঁর সবগুলো কাব্যনাটক রচনায় পুরাণ ব্যবহার করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদেরকে এলিয়টের কাছে ফিরে যেতে হবে। এলিয়ট তাঁর *Murder in the Cathedral* নাটকটি রচনা প্রসঙ্গে পুরাণ ব্যবহরের যৌক্তিকতা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> Verse plays, it has been generally held, should either take their subject matter from some mythology, or else should be about some remote historical period, far enough away from the present for the characters not to need to be recognizable as human beings, and therefore for them to be licensed to talk in verse.[২৮]

এলিয়টের এই চিন্তাকেই বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, এলিয়ট চরিত্রের অনুগামী ভাষা নয়, ভাষার অনুগামী চরিত্র সৃষ্টির কথা বলেছেন। সুতরাং কাব্যনাটকে ভাষা যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, একথা সহজেই অনুমেয়। এলিয়ট কাব্যনাটকের ভাষা হিসেবে কাব্যভাষাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে, কাব্যভাষা এমন হতে হবে যাতে সব ধরনের বক্তব্যই সঠিক আবেগ, অনুভূতি নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে। যদি কাব্যভাষা তা প্রকাশে ব্যর্থ হয় তাহলে সেটি কাব্যনাটকের যথাযথ ভাষা হবে না। তখন কাব্যনাটকের দৃশ্যটিকে নিপুণভাবে পাঠক ও দর্শকের সামনে তুলে ধরতে চাইলে কাব্যভাষার পরিমার্জন আবশ্যক। এক্ষেত্রে গদ্যভাষার ব্যবহার যদি দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয় তবুও সেটির ব্যবহার সমর্থন করেননি এলিয়ট। কারণ এর মাধ্যমে দর্শকের মনোযোগ ব্যাহত হতে পারে। 'নাটকে ব্যবহৃত ভাষাকে এলিয়ট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—গদ্য-সংলাপ, কাব্যসংলাপ ও কথ্যভাষাশ্রয়ী কাব্যসংলাপ।'[২৯] এলিয়ট এও বলেছেন যে কাব্যনাটকের ভাষা মানেই পুরোনোকালের ভাষার পরিবর্তন-পরিমার্জন করে ব্যবহার করা নয় বরং আধুনিক যুগোপযোগী ভাষার সন্ধান করা, সময়ের সঙ্গে যার যোগ থাকবে। এলিয়টের মতে :

> No poetry, of course, is ever exactly the same speech that the poet talks and hears : but it has to be in such a relation to the speech of his time that the listener or reader can say `that is how I should talk if I could talk poetry'[৩০].

পরিবর্তিত সময় ও মানসিকতাকে স্বীকার করে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাটকের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে গদ্য ছন্দ, শিল্পিত কাব্যভাষা, স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন যা পৌরাণিক আবহের পাশাপাশি আধুনিক জীবনবোধ, সমসাময়িক সমাজের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে সচেতন বার্তা প্রদান করে। বুদ্ধদেবের প্রতিটি নাটকে এলিয়ট প্রবর্তিত দুটি স্তরের দাবি (অন্তরাঙ্গ ও বহিরাঙ্গ) রক্ষিত হয়েছে। সেইসঙ্গে আধুনিক কাব্যনাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃশ্যমান ঘটনার আড়ালে অন্তর্বাস্তবতার চিত্রায়ণ। সেটা সৃষ্টিতে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সতর্ক অবস্থানে। বুদ্ধদেব কোরাসের ক্ষেত্রে এলিয়টের *Murder in the Cathedral* নাটক থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কাব্যনাটকে সে ছাপ স্পষ্ট। এছাড়াও বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কালসন্ধ্যা নাটকের অর্জুন চরিত্রে স্যামুয়েল বেকেটের নাট্যপ্রভাব রয়েছে, সংক্রান্তি কাব্যনাটকের কালের রূপায়ণে ও অম্বিকার মনোবেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইয়েট্‌স-এর কবিতার প্রভাব রয়েছে। কর্ণ চরিত্রের মনোবেদনা ও নিঃসঙ্গতা চিত্রায়ণে বোদলেয়ারে বিষাদ চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধদেব বসু এসব নাটক সৃষ্টিতে যেমন পাশ্চাত্য রীতি ব্যবহার করেছেন তেমনি নাটক মঞ্চায়নের জন্যও তিনি যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেখানে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবকে অঙ্গীকার করেছেন। কাব্যনাটকে প্রাচ্য প্রভাব বা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু কাব্যনাটক রচনাকৌশলে এলিয়টীয় নাট্যরীতি বা পাশ্চাত্য রীতিকেই অনুসরণ করেছেন।

পরিশেষে এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, আধুনিক বাংলা কাব্যনাটক রচনায় বুদ্ধদেব বসু প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নব আঙ্গিক ও বিশ্বসাহিত্য থেকে গ্রহণ করা নাট্যজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটান। ফলে কাব্যনাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি হয়ে ওঠেন অনেক বেশি সফল ও অগ্রগামী নাট্যকার। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল এ কারণে পুরাণ বিষয়নির্ভর কাব্যনাট্যের প্রকরণগত বিন্যাস ও মনস্তত্ত্ব সংযোজনে তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবিত হয়েছিলেন। আধুনিক মানসতার জটিল উপাচার আর সেগুলোর অভিনব রূপায়ণে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলো যেমন বিশিষ্টতার দাবিদার তেমনি সাহিত্যজগতে কাব্যনাটকের হাত ধরেই বুদ্ধদেবের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য সন্দর্শন*, (ঢাকা : সূচয়নী পাবলিশার্স, ২০১৪), পৃ. ৭০

২ আলী আনোয়ার, *আধুনিক ইউরোপীয় নাটক*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১২

৩ T.S. Eliot, [Introduction] P.C. Ghosh, *Poetry and Religion as Drama*. (London : World press, 1965), p. 2

৪ উত্তম দাশ, *বাংলা কাব্যনাট্য*, (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা : মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, ১৯৮৯), পৃ. ১১

৫ T.S. Eliot, *Selected Essays*. (London : Faber and Faber limited, 1951), p. 46

৬ T.S. Eliot, *Ibed*, p. 3

৭ মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, (ঢাকা : কবি প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ১৮

৮ রাম বসু, "কাব্যনাটক", তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), পৃ. ৩৮৪

৯ উত্তম দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১০ অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০), পৃ. ১০

১১ দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত, বুদ্ধদেব বসু *নাটক সমগ্র* ১, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩), পৃ. ৫৩০

১২ মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য*, (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৫

১৩ বুদ্ধদেব বসু, *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, (কলকাতা : এম.সি সরকার, ১৯৭৪), পৃ. ৪৬

১৪ বুদ্ধদেব বসু, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত, *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৫ T.S. Eliot, *The Waste Land*, (New Delhi : Rama Brothers, 2016), p. 34-35

১৬ রাম বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৭ বুদ্ধদেব বসু, *কালসন্ধ্যা*, দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত, *নাটক সমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৮ T.S. Eliot, *The Complete Poems and Plays of T.S. Eliot*, (London : Faber and Faber limited, 1973), p. 173

১৯ কণিকা সাহা, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ*, (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৪), পৃ. ১৫৪

২০ বুদ্ধদেব বসু, *কালসন্ধ্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

২১ কণিকা সাহা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

২২ T.S. Eliot, *Murder in the Cathedral,* (New York : Harcourt, Brace And Company, 1935), p. 73

২৩ বুদ্ধদেব বসু, *প্রথম পার্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

২৪ উত্তম দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

২৫ W.B. Yeats, *The Collected Poems of W. B. Yeats*, (New York : The Macmillan Company, 1951), p. 184

২৬ *Ibed*, page. 294

২৭ বুদ্ধদেব বসু, *অনাম্নী অঙ্গনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

২৮ T.S. Eliot, *On Poetry and Poets*, (London : Faber and Faber limited, 1957), p. 79

২৯ কণিকা সাহা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৩০ T.S. Eliot, *On Poetry and Poets*, *Ibed*, p. 31